Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.47-53
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রসঙ্গ ধর্ম ও নীতি : একটি সমীক্ষা

Dr. Debabrata Saha
Associate Professor, Kazi Nazrul University, Asansol, West-Bengal

Abstract

This paper aims to highlight Dharma (Religion) and Nīti (Morality) in the light of Indian Ethics. Dharma and Nīti just like two sides of a coin and closely connected or interlinked. Dharma flourishes through Nīti and Nīti shapes the human conduct through religion. We can say that Dharma is a combination of Nīti and it came in the society with the support of Nīti. Dharma embraces the people and Nīti lead the people to achieve the goal. In this regard it can be said that Nīti is not only for achieving or to acquire some beautiful character that people deserve but also to motive people to move forward on the way to ultimate goal or liberation or Moksa. In this paper I have tried to focus some issues related to appropriate nature or characteristic feature of Dharma and Nīti with the help of Indian ethical heritage and ancient scriptures.

জীবন গতি বড়োই বিচিত্র। এই যে বিচিত্রতা, এই বিচিত্রতার আনাচে কানাচে ধরা পড়ে বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি, যে অনুভূতি-গুলির সমীকরণে হার মেনে যায় আমাদের জীবন, হার মেনে যায় আমাদের সমাজ। সেই হার মানা সমাজ ও জীবনের আলোর দিশারী হল ধর্ম। যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ এই ধর্মের ব্যাখ্যা করে এসেছে এবং করে যাবে হয়তো আমরণ। গীতার পাতায় ভগবান বলেছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ',[1] আবার মনু বলেছেন, 'বেদোখিলো ধর্ম্মমূলম', আবার বুদ্ধের ভাষায়, 'অহিংসা পরমো ধর্ম, আবার যদি আমরা আজকের সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যায় আসি তো 'কর্মই ধর্ম'। ধর্মের এহেন হাজারো তকমায় আমরা হারিয়ে যাচ্ছি অন্ধকারে, হারিয়ে যাচ্ছি অজ্ঞানের গহনে। এই অন্ধকার ও অজ্ঞানের রাজ্য থেকে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করাতে পারে নীতি, যা ধর্মের মূল চাবিকাঠী।

ধর্মের একটা বুৎপত্তিগত অর্থ আছে। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা, এই ধারণ বিভিন্ন দিক থেকে হয়। যেমন, ব্যক্তি ও সমাজকে ধরে রাখে ধর্ম, আর ধর্মকে ধরে রাখে ব্যক্তি। আবার বিশেষ গুণ বোঝাতেও ধর্ম শব্দটি প্রযুক্ত, আবার ধর্ম নীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার শক্তি হিসাবেও ধর্ম ব্যবহৃত হয়। যেমন, উপনিষদে বলা হয়েছে, ধর্ম হল ক্ষত্রেরও ক্ষত্র। 'ক্ষত্র' শব্দের অর্থ হল নিয়ামক। ক্ষত্রিয় রাজাকে ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের তেজ এমনই যে, একজন সাধারণ মানুষও শারীরিক এবং রাজনৈতিক শক্তি যুক্ত বলবত্তর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধর্ম এমনই এক শক্তি, যে শক্তির বলেই মহাভারতে এক সামান্য সারমেয় মহারাজ জনমেজয়ের সভায় নিজের প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিলো। এই ধর্মের বলেই রামায়ণে ঈশ্বরের চিহ্নে চিহ্নিত রামচন্দ্রকে তিক্ততম ভাষায়

তিরস্কার করেছিলেন বালীর স্ত্রী তাড়া। বস্তুত এই ধর্মকে সর্বনিয়ামক এক সাংবিধানিক আইন বলা যেতে পারে। মনু এই ধর্মের নাম দিয়েছেন দণ্ড।[2]

আবার সাধারণ ধর্ম অর্থেও ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ধর্ম হল সত্য। সত্য বলতে শুধু সত্য কথা বলা নয়, সত্য রক্ষা করাও। সত্য বলতে এমন একটা নৈতিকতা যার সঙ্গে যুক্ত অহিংসা, ক্ষমা, উপকার, শম, দম, শীল ইত্যাদি। কিন্তু সত্য রক্ষা করা বিষয়টি হল, প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে, তা সে যাই হোক, ধন, মান, প্রাণ যাই যাক। সব কিছুর বিনিময়ে এই যে সত্য রক্ষার ধর্ম—এর মধ্যে স্নিগ্ধ সত্যের চেয়েও অন্য এক দৃঢ়তা আছে। বলা হয়েছে এই পৃথীবিতে ধর্মই সবচেয়ে বড়ো কথা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ধর্মেই।

আবার ঋগবেদ-এর প্রাথমিক যুগে যজ্ঞ অর্থেও ধর্ম শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যথা, যজ্ঞেন যজ্ঞম অযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।[3] আচার্য যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন, ধর্ম যজ্ঞেরই নাম, 'ধর্ম ইতি যজ্ঞস্য (নাম)'।[4] যে গুণ শক্তি বা স্বভাব দ্বারা কিছু ধৃত হয় বা যে শক্তি বা স্বভাব কোন কিছুকে ধারণ করে তাকেই ধর্মের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন বেদের কর্তারা। আবার সায়নাচার্য ধারক কর্ম অর্থেও ধর্মকে প্রয়োগ করেছেন। ধর্মের আরও একটি অর্থ বেদের কর্তারা উপলব্ধি করেছিলেন, যা হল নিয়ম। বিশ্বের শাশ্বত নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে ঋত বলার প্রচলন ছিল ঋগ্বেদ-এ। ঋত হল নৈতিক কর্মের মানদণ্ড। তাই নৈতিক দিক থেকে ঋত হল অলঙ্ঘনীয় ন্যায়নীতি। এই সত্য ও ন্যায়ের নীতিতেই বিশ্বের সবকিছুর স্বভাব ধর্ম পরিচালিত হয়। সত্য ও ন্যায়ের নীতি হল সামাজিক কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। এই ঋতকে প্রতিপালন করাই হল ধর্ম। বস্তুতঃপক্ষে ঋতই সত্য, ঋতই ব্রত, ঋতই শ্রদ্ধা, ঋতই ধর্ম, ঋতই অমৃত। আবার ঋত, সত্য, যজ্ঞ, ব্রহ্ম এসবই ধর্ম, এগুলি ধর্মেরই নানা প্রকারভেদ। সর্বসমন্বিত ধর্মই পৃথিবীর ধারক। উপনিষদের যুগে শ্রেয় বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ধর্ম শব্দটি প্রচারিত হয়েছে। জাগতিক বিষয় সুখ ছেড়ে পরমাত্মা ভোগরূপ শ্রেয় তত্ত্বের সন্ধানেই ছুটেছেন উপনিষদের ঋষিরা। এই শ্রেয় লাভই ধর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই শাস্ত্রবিহিত আচার-সদাচার ও মানুষের স্বকীয় শুভচিন্তনও ধর্ম রূপে বিবেচিত।

মনুও চারটি বিষয়কে ধর্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণরূপে উল্লেখ করেছে, যথা, বেদ বা শ্রুতি, ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি, শিষ্টজনের আচার আচরণ এবং নিজ মনের সন্তুষ্টি। আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও উদার মনোভাব এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তাঁরা শুধু শ্রুতি ও স্মৃতিকেই ধর্মের প্রমাণরূপে স্বীকার করেন নি, সেই সঙ্গে আরও দুটি বাস্তব বিষয়কে যুক্ত করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে শিষ্ট ব্যক্তির, সজ্জনের, মহাজনের আচার আচরণকেও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়। মহাজনের মত ও পথই আমাদের অনুসরণযোগ্য। তবে বেদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন স্মৃতি, এমন কোন সদাচার, এমন কোন আত্মতুষ্টি, কখনো ধর্মের প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে না।
তাই মনুসংহিতাকারের উপলব্ধিতে আমরা দেখতে পাই,

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ নিত্যম্ অদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েন অভি-অনুজ্ঞাতঃ যঃ ধর্মঃ তম্ নিবোধত।[5]

অর্থাৎ হিংসারাগশূন্য সজ্জন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদা আচরিত এবং মনে মনে অনুমোদিত যে আচরণ সমষ্টিরূপ ধর্ম সেই ধর্ম আপনারা আমার কাছ থেকে শুনুন। বৈদিক বিধিসমূহের মধ্যে যেগুলির আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে এবং যেগুলি বেদবিদ্যাবিদ্‌গণ অনুমোদন করেন, কেবল সেই বিধিগুলিকেই আমরা গ্রহণ করব। যদি আমরা যথাযথভাবে এবং নিয়মিতভাবে এই বৈদিক বিধি-নির্দেশগুলি

পালন করি তাহলে আমাদের হৃদয়-মন যাবতীয় কলুষ ও মলিনতা থেকে মুক্ত হবে এবং এই পরিস্কৃত ও শুদ্ধ মনই তখন আত্মজ্ঞান গ্রহণে সক্ষম হবে। অতএব বৈদিক বা শ্রৌতকর্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ধর্ম জাত হয় তা আত্মজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয়।

আবার ধর্মপ্রিয় অশোকের 'দেবানাং পিয় পিয়দসি' অনুশাসন ধর্মের নিষ্ঠারূপের পরিচায়ক। আবার কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহে অর্জুনের 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' এই উপলব্ধি ধর্মের সেই সত্য স্বরূপের প্রকাশ। ধর্মের ভাবজগত যেমন একজন ছাত্রের অধ্যয়নকে তপস্যায় উন্নীত করে, তেমনি একজন কবি বা দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেও সার্থক করে। সুতরাং ধর্ম হল ব্যক্তি হৃদয়ের সেই আদর্শ, যা তাঁর আন্তর্জগতের অনুভূতিকে বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, যা মানবধর্মরূপে অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বধর্মে উন্নীত হয়। এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের রহস্যময়ী শক্তিকে ধরার তীব্র আকুতি। এই আকুতি রূপ পায় নানা জাতি, ভাষা ও ভাবের মধ্য দিয়ে। সেই রহস্যময়ী শক্তি কারো কাছে নিরাকার ব্রহ্ম, কারো কাছে মূর্তিমান ঈশ্বর, কারো কাছে ঈশ্বরকণা, কারো কাছে আবার মনের মানুষ।

ধর্মই মানুষকে সংযমী, সাহসী, ধীর, বীর, জিতেন্দ্রিয় এবং কর্তব্য পরায়ণ করে। ধর্মই দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, পরদুঃখ-কাতরতা, সেবা, সত্য এবং ব্রহ্মচর্যের পাঠ শেখায়। মনু ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলেছেন,

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যম ক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।[6]

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নির্মলবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি হল ধর্মের লক্ষণ।

মহাভারতে বলা হয়েছে,

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণামনসাগিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।[7]

অর্থাৎ মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা সকল প্রাণীর সঙ্গে অদ্রোহ, সকলের প্রতি কৃপা এবং দান এটিই হল সাধু পুরুষদের সনাতন ধর্ম। পদ্মপুরাণে ধর্মের লক্ষণে বলা হয়েছে,

ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন মখপঞ্চকবর্তনৈঃ।
দানেন নিয়মৈশ্চাপি ক্ষান্ত্যা শৌচেন বল্লভ।।
অহিংসয়াসু শান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপিবর্তনৈঃ।
এতৈর্দশাভি বঙ্গৈস্তু ধর্মমেব প্রপূরয়েত।।[8]

অর্থাৎ হে প্রিয়, ব্রহ্মচর্য, সত্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি এবং অস্তেয় দ্বারা আচরণ করাই হল ধর্ম।

এখন প্রশ্ন হল, কোনো ব্যক্তি কি মন এবং ইন্দ্রিয়ের চাকর, কোনো ব্যাক্তি যদি বিদ্যা-বুদ্ধিহীন হয়, হিংসা-পরায়ণ হয়, পরস্বার্থ হরণকারী হয় তাহলে সে কি সুখী অথবা উন্নত হতে পারে? আপনারা স্বয়ং বিচার করুন। ধর্মের এই তত্ত্বগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি কি এই জগতে সুখ পূর্বক চিরকাল টিকে থাকতে পারে? ধর্মের নাম পর্যন্ত যারা মুখে আনেন না, তাঁরা যদি পক্ষপাত শূণ্য হয়ে গভীর ভাবে শান্ত চিত্তে চিন্তা করেন তাহলে তাঁরাও বুঝতে পারবেন যে, ধর্মই আমাদের ইহকাল-পরকালের একমাত্র সহায়ক এবং সঙ্গী।

ধর্ম মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের শীতলতায় পর্যবসিত করে, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যায়, তমসাবৃত হৃদয়ে অপূর্ব জ্যোতির প্রকাশ এনে দেয়। ধর্মই চরিত্র গঠনের একমাত্র সহায়ক। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সাথে কোন কিছু যায় না, যায় শুধু ধর্ম। তাই যখন ধর্মের সম্মান থাকবে না, তখন পশু ধর্ম বিস্তার লাভ করবে। আসলে ধর্ম বলতে এক প্রকার সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার প্রতি মানুষের চূড়ান্ত অনুরাগকে বোঝানো হয়। ধর্ম শব্দটি তাই মানব জীবনের পূর্ণ নৈতিক শুদ্ধতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। তাই ধর্মের ব্যঞ্জনা অত্যন্ত ব্যাপক। এই ব্যঞ্জনা কোন স্থানে, কালে বা নির্দিষ্ট সমাজে শৃঙ্খলায়িত করতে পারেনা। এই ধর্ম মানবীয় সত্তা হিসাবে মানুষকে পূর্ণতা দান করে। তাই ধর্মের সাথে নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নীতি শব্দের অর্থ হল যা লক্ষ্য পথে নিয়ে যায়। যা নীতি সম্বন্ধীয় তাই নৈতিক। মহাভারতের শান্তিপর্বে নীতি শব্দের স্বতন্ত্র স্থান লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে পিতামহ ভীস্ম শরশয্যায় শায়িত হয়ে নীতি সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা ধর্মের ভিত্তি। মানবজীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নীতির আবশ্যকতা রয়েছে। সমাজে যা কিছু নিয়ম দেখা যায় সেগুলির নৈতিক মূল্যবোধও স্বীকৃত। নীতির মূলে আছে সমাজের কল্যাণ। সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর তাই সৎ এবং যা অকল্যাণকর তাই অসৎ। নীতির উদ্দেশ্য হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা। মানবজীবন নৈতিক দ্বন্দ্ব ও তার সমাধানের অনন্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে।

ধর্মের পক্ষে নীতি অত্যন্ত জরুরী। নীতি ছাড়া ধর্ম অপরিণত থাকে। সেই অপরিণত ধর্মবিশ্বাস থেকে উৎপন্ন হয় ধর্মের নামে গণউন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম ও নীতির লক্ষ্য ভিন্ন হলেও তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধীতা নেই। বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। ধর্মই নীতির উৎস।

ধর্মাচারণের ফলে মানুষের মধ্যে সমতা, শান্তি, দয়া, সন্তোষ, সারল্য, সাহস, নির্ভয়তা, বীর্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের স্বাভাবিক বিকাশ হয়। তাই বলা যায়,

ধর্মেণ ধার্যতে পৃথ্বী ধর্মেণ তপতে রবিঃ।
ধর্মেণ বয়াতি বায়ুশ্চ সর্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিতম্।।

ধর্মের ভিত্তিতেই পৃথিবী টিকে আছে। ধর্মের দ্বারাই সূর্য তাপ বিকিরণ করছে। ধর্মের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত— সমগ্র বিশ্বসংসার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সবকিছুর আধার হল ধর্ম। সবকিছুর আধার ধর্ম আর এই ধর্মের আধার হল নীতি। ধর্ম যদি একটা মালা হয়, তো নীতি হল সেই মালার প্রতিটি পুষ্প। মালা থেকে পুষ্প গুলিকে সরিয়ে ফেললে যেমন মালার অস্তিত্ব থাকে না তেমনি ধর্ম থেকে নীতি গুলিকে সরিয়ে ফেললে ধর্মেরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

ধর্ম কতগুলি আচার-আচরণের সমষ্টি। তাই ধর্মাচারণই নীতি। ধর্ম যে আচরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় তা নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার মানুষের বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে ধর্মই নিয়ন্ত্রক। যেমন, পুরুষার্থরূপে কাম ও অর্থ যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে মানুষ বিপথগামী হতে পারে এবং তার ফলে সামাজিক কল্যাণ বিঘ্নিত হতে পারে। কাম পুরুষার্থ হলেও তা কল্যাণকর হয় যদি তা ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী না হয়। অর্থ সমন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত না হলে অর্থও অনর্থের মূল হতে পারে। অর্থাৎ কাম ও অর্থ ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেই মানুষ যথার্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারবে। আবার নীতির দ্বারাই ধর্ম একটি পরিপূর্ণ রূপ পাই। তাই ভারতীয় পরম্পরাই নীতির আলাদা করে অলোচনার প্রয়োজন হয় নি, ধর্মের অলোচনার মধ্যেই নীতি অব্যাক্তভাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। উপরিউক্ত ধর্মের বিভিন্ন লক্ষণের ভিতর দিয়ে যে ধর্মাচারণ উল্লিখিত হয়েছে সেখানে নীতির প্রভাব অতুলনীয়। তাই

নীতি বিনা ধর্ম বা ধর্ম বিনা নীতি ভাবাই যায় না। ধর্মকে ধর্ম হিসাবে টিকে থাকতে হলে নীতির সাহায্য ছাড়া তা কখনোই সম্ভব নয়।

ভারতীয় পরম্পরাই কর্মবাদকে নৈতিকতার পূর্বস্বীকৃতি বলে গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র আস্তিক দর্শনে নয়, কোন কোন নাস্তিক দর্শনেও কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। ভারতীয় পরম্পরাই একটি নৈতিক নিয়ম স্বীকার করা হয় যা অমোঘ। মানুষের জীবনের শৃঙ্খলাও একটি নৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্মই এই নিয়মের অধীন। প্রকৃতির ঘটনাবলী যেমন নিয়মাধীন সেইরকম মানুষের কর্মও একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। এই বিশ্বে কোন কিছুই অকারণ নয়। কামনা থেকেই সমস্ত কর্ম প্রবৃত্ত হয়।

ভারতীয় দর্শনচর্চার পিছনে মানুষের জীবনকে সমুন্নত করার নির্দিষ্ট প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি যার সামনে ছিল একটি আধ্যাত্মিক ধ্রুবতারা। ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে পার্থিব সুখলাভের আদর্শ থেকে পৃথক করেছেন। যে নীতি মানুষকে সুখ-দুঃখের পরপারে নিয়ে যায়, যা অত্মোপলব্ধির মহিমায় ভাস্বর তাই ভারতীয় দর্শনে শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হয়েছে। আত্মোপলব্ধি মানুষের 'শ্রেয়'। আর জাগতিক তৃপ্তি হল 'প্রেয়'। প্রেয় লাভের ফলে আত্মোপলব্ধি হয় না। যে ব্যক্তি প্রেয় ও শ্রেয়ের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত তিনিই প্রাজ্ঞ। সুতরাং একথা অবশ্যই বলতে হয় যে, নীতি মানুষকে শুধু যে সুন্দর চরিত্র লাভের অধিকারী করতে চাই তা নয়, তাঁকে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতেও উদ্বুদ্ধ করে। তবে যে কোন মানুষের পক্ষে হয়তো মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রয়োজন, তা নাহলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই যেখানেই নীতির কথা আলোচনা হয়েছে সেখানেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই ধর্মে পরিণত হয়েছে। ধর্ম হল একটি নৈতিক বিধি যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম একটি নীতি যা ব্যক্তিকে সমাজ কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে।

ধর্ম ও নীতির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকলেও ধর্মের সঙ্গে কিছু সংস্কার এমনভাবে জড়িয়ে থাকে, যা ব্যক্তি ও সমাজকে পিছনে টানে। এক্ষেত্রে নীতি কোন অবস্থাতেই তা মেনে নিতে পারে না। যেমন, সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, দেবদাসী প্রথা এবং নরবলি প্রভৃতি এক সময় স্বীকৃত ছিল ধর্মে। এ ধরণের কিছু সংস্কার ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে পিছনে টানে। প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর বুদ্ধি ও সংস্কার অনুযায়ী যেগুলিকে পাওয়ার চেষ্টা করে, সেগুলিকে প্রাপ্তির পক্ষে যথানির্দিষ্ট উপায় অবলম্বনের স্বাতন্ত্র্য তার আছে, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার অর্থ কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতারই অপর নাম অধর্ম বা ধর্মবিরোধীতা। যেমন, একজন মোক্ষকামী ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে, কিন্তু যদি তিনি গৃহস্থ হন, তাহলে তাঁর উপরে নির্ভরশীল পরিবারকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ সর্বথা অধর্ম, পুনরায়, তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমে থেকেই শম-দমাদি সম্পত্তির পরিচর্যা করতে পারেন এবং সংসারের যন্ত্রণাদায়কতা লক্ষ্য করে নিজেকে মানসিক দিক থেকে বিষয় ভোগ নিবৃত্ত করতে পারেন, তবে সেটাই হবে তার পক্ষে পরম ধর্ম। ব্যক্তি ধর্মাচরণের নামে কখনোই এমন কোন কাজ করবে না, যা তার পারিপার্শ্বিককে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং পরিণামে আত্মবিনাশের হেতু হয়। সেই কারণে পাতঞ্জল সূত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা[9] ভাবনার দ্বারা চিত্তকে সমভাবাপন্ন বা প্রসন্ন করে তোলার যে পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে, তা বস্তুত সমস্ত জীবের পক্ষেই বিভিন্ন মাত্রায় পরিচর্যনীয়। সেখানে বলা হয়েছে সমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, মিত্রতা। দুঃখী, হীনবলের প্রতি তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা নয়, করুণা। অধিক সম্পন্নের প্রতি ঈর্ষা নয়, আনন্দিত মনে তার সাফল্যের উদযাপন এবং নৈতিক দৃষ্টিতে যে হীন, তার প্রতি ঔদাসীন্য। অন্য লোক কতটা দুষ্ট চরিত্র তা নিয়ে উদ্বেগ না হওয়া। অর্থাৎ মন্দ বিষয়

উপেক্ষা করা। এগুলি বৌদ্ধধর্মে একই ভাবে আলচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এগুলি ব্রহ্মবিহার নামে খ্যাত। এগুলির দ্বারা সকলের কল্যাণ সাধিত হয়।

উপসংহার: 'নীতি' শব্দ বলতে বোঝায় কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক সূত্র বা বিধি নিয়ম। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে 'ধর্ম' শব্দটি সাধারণত এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক শাস্ত্রকেই 'ধর্মশাস্ত্র' বলা হয়। মনে করা হয় ধর্মের দুটি দিক, একটি হল ব্যবহারিক ধর্ম ও অপরটি হল মোক্ষধর্ম। পারিবারিক, সামাজিক বা জাগতিক সম্পর্কে অপরের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা হয়, তারই নাম ব্যবহারিক ধর্ম। পাশ্চাত্যে একেই নীতি (Morality) বলে। আর পরমেশ্বরের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভ হেতু যে সকল বিশিষ্ট সাধন প্রণালী নির্দিষ্ট আছে তারই নাম মোক্ষধর্ম। পাশ্চাত্যে একে ধর্ম বা রিলিজিয়ন বলেন। আমাদের নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা সকলই মোক্ষানুকুল, এই হেতু প্রাচীন শাস্ত্রে 'নীতি' ও 'ধর্মে' বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় নি। কিন্তু পাশ্চাত্যে নীতি-তত্ত্বের ভিত্তি আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই তাঁরা নীতি-তত্ত্বকে মোক্ষতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলেছেন।

উপরউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ধর্ম ও নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকেই এটা পরিস্ফুট হয় ধর্ম কতগুলি নীতির সমাহার। আবার নীতির আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, যা নীতি সঙ্গত তাই ধর্ম। তাই বলা যায়, নীতি সঙ্গত ধর্মই হল মানুষের চরিত্র গঠনের একমাত্র চাবিকাঠী। নীতি সঙ্গত ধর্মই মানুষকে পূর্ণতা দান করে। ধর্মের বিভিন্ন যে অপব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই, তারও নিরসন ঘটে এই নীতি সঙ্গত ধর্মের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। আমরা যদি ধর্মের ব্যাখ্যায় নীতির কোন স্থান না রাখি তাহলে সেই ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যারূপেই পরিগণিত হবে। উপরিউক্ত প্রতিটি ধর্মের লক্ষণের ক্ষেত্রে নীতি শব্দটি উহ্য থাকলেও নীতির স্থান বিন্দুমাত্র লোপ পাই নি। ধর্ম নীতির হাত ধরেই এই সমাজে এসেছে এবং নীতির হাত ছেড়েই এই সমাজ থেকে বিদায় নেবে। অর্থাৎ ধর্মে যখন নীতির হাত থাকবে না তখন ধর্ম আর ধর্ম থাকবে না, অধর্মে পরিণত হবে। সে কারণেই হয়তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার নিয়েছিলেই এই ধরাধামে অধর্মের নাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি কুরুক্ষেত্রের রনাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নীতি কথার মধ্য দিয়েই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধরাধামে যে সকল মহাপুরুষ আজ অবধি অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নীতিকে পাথেয় করে ধর্মকে রক্ষা করেছেন। তাই নীতি বিহীন ধর্ম অসম্ভব। 'ধর্ম' মানুষ এবং সমাজকে ধারণ করে আর 'নীতি' মানুষ এবং সমাজকে লক্ষ্য পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্ম ও নীতি একে অপরের বিরোধী নয় বরং পরিপূরক।

তথ্যসূত্র

1 গীতা ১৮/৬৬

2 মনুসংহিতা ২/৪৫-৪৭

3 . ঋকসংহিতা ১/১৬৪/৫০

4 . নিরুক্ত ৩/১৩

5 মনুসংহিতা ২/১

6 মনুসংহিতা ৬/৯২

7 মহাভারত, বনপর্ব ২৯৭/৩৫

৪ পদ্মপুরাণ ১২/৪৬-৪৭

৯ যোগসূত্র ১/৩৩

গ্রন্থপঞ্জী:

১। অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ,শ্রীল , (২০২০), ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিবেদান্তবুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর ধাম, নদীয়া।
২। অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ) ,শ্রীল ,২০২০ ,(শ্রীমদ্ভগবদগীতা ,ভক্তিবেদান্তবুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর ধাম, নদীয়া।
৩। কর) ,শ্রীগঙ্গাধর ,২০১৯ ,(মহাজীবনের অন্তরালেযাদ ,বপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা। ,মহাবোধি বুক এজেন্সী ,
৪। গুপ্ত) ,দীক্ষিত ,২০১৭ ,(নীতিশাস্ত্র কলকাতা। ,সল্টলেক সিটি ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ,
৫। চক্রবর্তী) ,লোকনাথ ,২০১৯ ,(বেদান্ত কলকাতা। ,মহাবোধি বুক এজেন্সী ,সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ,পরিভাষা-
৬। চট্টোপাধ্যায়) ,শ্রীসতীকুমার ,২০০৭ ,(সমন্বয়মার্গ কলকাতা। ,বিধান সরণী ,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ,
৭। পাহাড়ী ,অন্নদাশঙ্কর .ড ,(২০১২), মনুসংহিতা (দ্বিতীয় অধ্যায়), সংস্কৃত বুক ডিপো, বিধান সরণী, কলকাতা।
৮। ভট্টাচার্য) ,উমেশচন্দ্র ,১৪২০ ,(ভারতদর্শনসারবিশ্বভারতী , গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা। ,
৯। সেন) ,অলোককুমার ,২০১৭ ,(চাণক্য শ্লোক ও নীতিক কলকাতা। ,ভবানী দত্ত লেন ,গীতাঞ্জলী ,